অধ্যায় ১৩ : মৈমনসিংহ গীতিকা— ২

বিন্যাসক্রম

১৩.১ জ্ঞাতব্য বিষয়
১৩.২ পরিচিতি
১৩.৩ কঙ্ক ও লীলা পালা
১৩.৪ কাজলরেখা পালা
১৩.৫ শব্দার্থ বোধ
১৩.৬ লোকসাহিত্যের উপাদান
১৩.৭ গীতিকার বৈশিষ্ট্য
১৩.৮ চরিত্র বিশ্লেষণ
১৩.৯ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম
১৩.১০ অতিরিক্ত পঠন
১৩.১১ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর-সংকেত
১৩.১২ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১৩.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

- বাংলা সাহিত্যে মৈমনসিংহ গীতিকার ‘কঙ্ক ও লীলা’ পালা সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- মৈমনসিংহ গীতিকায় অন্তর্ভুক্ত ‘কাজলরেখা’ পালাটিকে রূপকথা কেন বলা হয়েছে জানতে পারবেন।
- গীতিকার বৈশিষ্ট্য, লোকসাহিত্যের উপাদান প্রভৃতি বিষয়ে অবগত হতে পারবেন

১৩.২ পরিচিতি

১৯২৩ থেকে ১৯৩২ সালের মধ্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মৈমনসিংহ গীতিকা এবং পূর্ববঙ্গ গীতিকা নামে পালাগুলি প্রকাশিত হয়। এই পালাগুলিকে দীনেশচন্দ্র সেন ‘Eastern Bangal Ballads Mymensing’ নামে ইংরেজিতে অনুবাদ করে প্রকাশ করেন। এই অনুবাদের মাধ্যমে গ্রামীণ গীতিকাগুলি বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সুধীজনদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মৈমনসিংহ গীতিকার অন্তর্গত কিছু পালা গানেমুসলমান সম্প্রদায়ের হৃদয়ের অপূর্ব মিলন ঘটেছে। এখানে নারী-পুরুষ উভয়ের প্রেমের ত্যাগ, তিতিক্ষা ও বেদনা অপূর্ব মাধুর্যে ভরে উঠেছে। প্রেমের ধর্ম নিরপেক্ষ আবেদন গীতিগুলোকে রসোত্তীর্ণ করেছে। এর কাহিনি ও ভাষা বাস্তব জীবনকে অবলম্বন করে গড়ে ওঠেছে। শুধু তা-ই নয় বিশুদ্ধ মানবিকতা গীতিকাগুলিকে কাব্য গুণান্বিত করেছে।

১৩.৩ কঙ্ক ও লীলা পালা

কবি চতুষ্টয় প্রণীত (দামোদর, রঘুসুত, নয়ানচাঁদ ঘোষ ও শ্রীনাথ বেনিয়া) 'কঙ্ক ও লীলা' পালা 'লীলার বারোমাসী' নামে প্রচলিত ছিল। মৈমনসিংহ গীতিকার মহুয়া, মলুয়া, চন্দ্রাবতীর তুলনায় 'কঙ্ক ও লীলা' পালার নায়িকা লীলা অনেকটাই নিষ্প্রভ। এই পালার বেশির ভাগ জুড়েই পিতা গর্গ ও তৎকালীন সমাজের নীতি নিয়মের বেড়াজালে লীলাকে আবদ্ধ হরিণীর মতো ছটফট করতে দেখা যায়।

'কঙ্ক ও লীলা' পালাটির কাহিনি হচ্ছে এক দরিদ্রা ব্রাহ্মণ পরিবারে কঙ্ক-এর জন্ম হয়। তার জন্মের ছয় মাস পরে তার পিতা-মাতার মৃত্যু হলে সে এক আশ্রয় পায় মুরারী চণ্ডালের ঘরে। কিন্তু বিধবা মা, কঙ্কের পাঁচ বছর বয়সে সেই চণ্ডা-চণ্ডালিনীও মৃত্যুবরণ করেন। তারপর এক ব্রাহ্মণ নাম তার গর্গ শ্মশানে ক্রন্দনরত শিশু পুত্রকে দেখে নিয়ে যান আপন আলয়ে। ব্রাহ্মণের স্ত্রী দেবী গায়েত্রী কঙ্ককে পেয়ে যার পর নাই খুশি হয়ে ওঠেন। কারণ তিনি ছিলেন পুত্রহীনা। তাদের একমাত্র শিশুকন্যা লীলার সাথে পুত্র কঙ্ককেও আপন পুত্র সন্তানের মতোই তারা লালন পালন করতে লাগলেন। লীলাও কঙ্কের সাথে খেলাধূলা করে সময় কাটাতে থাকে,।

"আদরে যতনে কঙ্কের সুখে দিন যায়।
লেখাপড়া করে আর ধেনু যে চড়ায়।"

গায়েত্রী দেবীর লালন পালনে কঙ্কের জীবন স্বচ্ছন্দে কাটলেও সে সুখও তার কপালে বেশি দিন স্থায়ীত্ব পায়নি। কিছুদিন পরেই আবার তার কপালে জুটে মাতৃবিয়োগের দশা। দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম নিয়ে চণ্ডালের ঘরে আশ্রিত হয়ে আবার ব্রাহ্মণ পরিবারে পালিত হয় কঙ্ক। এরপর জীবনের নানা ঘটনা বিপর্যয়ের পর এক মুসলিম পীরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করার সুযোগ পায়। প্রথম জীবনে ব্রাহ্মণের কাছ থেকে সে নানা শ্লোক, মন্ত্র, গান শিখে আর পরবর্তীতে পঞ্চপীরের দরগায় দোয়া কালাম শিখে, গান গায়, প্রসাদ খায় আর ধর্ম নিয়ে নানা আলাপ আলোচনা করে। কঙ্কের এহেন কার্যকলাপ সাধারণ মানুষ সহজভাবে গ্রহণ করতে পারে না। নিজের জাতি ধর্মকে হেয় জ্ঞান করে পীরের প্রসাদ খাওয়া, তার দীক্ষা গ্রহণ করা এসবে সমাজপতিরা ক্ষুব্ধ হয় এবং তাকে ধিক্কার জানায়। কিন্তু এতকিছু কঙ্ককে নিয়ে ঘটে গেলেও কঙ্ক যেন এসবের উর্দ্ধে বিচরণ করছে। তাই কোন কিছুই তাকে স্পর্শ করতে পারে নি। অন্যদিকে তার ভক্তি, শ্রদ্ধা ও কাব্য প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে পীর কঙ্ককে 'সত্যপীরের পাঁচালী' রচনা করার কথা বললে সে সেই আদেশ পালন করে এবং দেশে বিদেশে তার সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে।

অন্যদিকে অসাধারণ প্রতিভার জন্য পণ্ডিত গর্গ কঙ্ককে আবারও ব্রাহ্মণ সমাজে মর্যাদা দিতে চান, তাই তাকে জাতে তোলার জন্য উৎসাহী হয়ে উঠেন। কিন্তু এই কাজ এত সহজে হবার নয়। সমাজের মাথা স্থানীয় ব্যক্তিরা বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে এই কাজ করতে নিষেধ করেন। তারা বলেন,।

"জন্মিয়া চন্ডালের অন্ন খায় যেই জন।

যে তারে সমাজে তুলে নহে সে ব্রাহ্মণ।।
অনাচারে জাতি নষ্ট, নষ্ট হয় কুল।
মাটিতে পড়িলে কেহ নাহি তুলে।।"

এতো কিছুর পরেও কঙ্ক ব্রাহ্মণ সমাজে আবারও প্রতিষ্ঠা লাভ করে কিন্তু এবার হিন্দু-মুসলমান দুই জাতির সমাজপতির ক্রোধাগ্নিতে সে পড়ে। হিন্দুরা বলে চন্ডালের পুত্র আর মুসলমানেরা তার রচিত সত্যপীরের পাঁচালী জ্বালিয়ে ভস্ম করে দেয়। এমনকি লীলাকেও মিথ্যা কলঙ্কিনী করতে তারা পিছু পা হয় না। এসব কিছু গর্গের কর্ণগোচর হলে তিনি তাতে বিশ্বাস করে ক্রোধান্বিত হয়ে ওঠলেন,।

"দুগ্ধ দিয়া কালসাপে করিনু পোষণ।
ফাক পাইয়া সেই মোরে করিল দংশন।।
খেদাইলে দূরে তবু মিটে নাই আশ।
স্বহস্তে নিশ্চয় কঙ্কে করিব বিনাশ।।"

এরপর তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন প্রথমে কঙ্ককে ও পরে লীলাকে নিজের হাতে বিষ খাইয়ে হত্যা করবেন; বলে সংকল্প করেন,।

"কি কলঙ্ক কৈল মোর কহন না যায়।
কঙ্কেরে মারিয়া পরে মারিব লীলায়।।
তারপরে প্রবেশিয়া জলন্ত আগুনে।
প্রায়শ্চিত্ত করব নিজে শরীর দহনে।।"

এদিকে গোপনে লীলা সমস্ত কিছু জানিয়ে দেয় কঙ্ককে এবং পরামর্শ দেয় কঙ্ক যেন দেশান্তরি হয়ে যায়। যে দেশে বান্ধব নেই সেখানে যেন দেশান্তরি হয়ে যায়। অন্যদিকে গর্গের মন ক্রমে চঞ্চল হতে থাকে। তার প্রায়েশ্চিত্তের জন্য প্রায় প্রাণ বিসর্জন দেওয়ার আগে আশ্রমে অন্য এক ঘটনা ঘটে। কঙ্কের জন্য রাখা বিষ মাখা ভাত সুরভী গাভী খেয়ে ফেলে ও তার মৃত্যু হয়। লীলা এইসব সহ্য করতে পারে নি। ফলে সে বলে ওঠে,।

"আশ্রমে গোহত্য হইল আমার কারণ।
অগ্নিতে পশিয়া আমি ত্যজিব জীবন।।"

লীলা খুব কষ্ট পেয়েছিল তার পিতার আচরণে। কারণ কঙ্কের জন্য তুলে রাখা ভাতে তার পিতা বিষ মাখিয়ে ছিলেন। সেই ভাতটুকুকে লীলা সরিয়ে রাখে কিন্তু আশ্রমে পালিত ধেনু সুরভি তা খেয়ে মৃত্যু বরণ করে। কঙ্কের গৃহ ত্যাগ ও সুরভীর মৃত্যু লীলাকে একাকী করে তোলে। ছোটবেলা থেকেই সে লীলাকে নিজের সুখ-দুঃখ ভাগ করে এসেছে, আজ তার কাছে কেউই নেই যাকে সে নিজের মনের কথা বলে দুঃসহ ভার কিছুটা হলেও লাঘব করতে পারে। এরপরেও কঙ্কের ফিরে আসার প্রতীক্ষায় দিন গুনতে গুনতে তার জীবন অতিবাহিত হচ্ছিল। কিন্তু জনরবে কঙ্কের জলে ডুবে মৃত্যুর কথা শোনায়

তার আশা একেবারে মরে যাওয়ায় সেও প্রাণ ত্যাগ করল। লীলার মৃত্যু দৃশ্য পল্লীকবির কলমে অত্যন্ত মর্মস্পর্শী হয়ে উঠেছে।

১৩.৪ কাজলরেখা পালা

'কাজলরেখা' পালাটিকে দীনেশচন্দ্র সেন বলেছেন 'এটি একটি রূপকথা'। এই কথাটি বলার কারণ 'কাজলরেখা' পালাটিতে গীতিকার ধর্ম আদ্যন্ত অনুসৃত হয় নি। এই পালার মূল চরিত্র কাজলরেখার ব্যক্তিগত জীবন সমস্যা একমুখী গতি লাভ করে নাট্য গুণান্বিত হয়ে উঠতে পারেনি। গীতিকায় অলৌকিকতা থাকে, কিন্তু তা বাস্তব জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। কিন্তু এই পালার সূচনাতেই সূঁচবিদ্ধ রাজকুমারের অবতারনা, শুক পক্ষীর উপদেশ, রুদ্ধদ্বার মন্দিরে সন্ন্যাসীর আবির্ভাব ইত্যাদি ঘটনা পালাটিতে অলৌকিকতা নিয়ে এসেছে।

পালাটির কাহিনি এইরকম সাধু ধনেশ্বর জুয়াতে সব হারিয়ে ফকির হয়ে পড়েছিলেন। তার হাতী, ঘোড়া, লোক লস্কর কিছুই থাকেনি। তার কন্যা বিয়ের উপযুক্ত। এগার বছরের কন্যা বিয়ে না দিলেই না হয়। কিন্তু জুয়ারী বাপের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে করতে কেউই রাজী নন। এমন সময় এক সন্ন্যাসী এসে দেখা দিলেন। তিনি সদাগরকে একটি শুক পক্ষী আর একটি আংটি দিলেন। এই পাখিটি ছিল ধর্মমতি শুক। সদাগর এই পাখির পরামর্শে সমস্ত কাজ করতেন। তার কথাতেই আংটি বিক্রি করে বাণিজ্যে মেলা দিলে ধীরে ধীরে সে ধনী হয়ে ওঠল। তারপর তার রূপবতী কন্যার বিয়ের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে পাখি বলে ওঠে—

"মরা সোয়ামীর কাছে এই কন্যার বিয়া হইব। এই কন্যারে তোমার পুরীর মধ্যে রাখ্যো না বনের মধ্যে নিবাস দিয়া আইস।"

এই আদরের কন্যার হেন ভাগ্য শুনে সদাগর বিলাপ করতে লাগলেন।

অবশেষে একদিন সদাগর কাউকে কিছু না বলে কন্যাকে নিয়ে যাত্রা শুরু করলেন। যেতে যেতে অরণ্য জঙ্গলের অনেক গভীরে গেলে সেখানে একটি ভাঙা মন্দিরের কাছে এসে তারা থামেন। মন্দিরের দরজা বন্ধ। বাবা মেয়ে সেই মন্দিরের সিঁড়িতে বসলে কাজলরেখা বাবাকে জল তেষ্টার কথা জানাল। সদাগর কাজলরেখাকে সেখানে অপেক্ষা করতে বলে জলের সন্ধানে গেলে কাজলরেখা মন্দিরের কপাটে হাত লাগাতেই কপাট নিজে থেকেই খুলে গেল। তারপর কৌতুহল বশত মন্দিরে প্রবেশ করলে নিজে নিজেই আবার কপাট বন্ধ হয়ে গেল। অনেক চেষ্টা করেও সে কপাট খুলতে পারল না। সদাগর জন্ম নিয়ে এসে মেয়েকে ডাকলেন কিন্তু কোন সাড়া পেলেন না। কিছু সময় ডাকাডাকির পর মন্দিরের ভিতর থেকে সে সাড়া দিল আর সমস্ত ঘটনা খুলে বলল। পিতা ও পুত্রী মিলে অনেক চেষ্টা করেও মন্দিরের কপাট খুলতে পারলেন না তখন সেই ভাঙার চেষ্টা করলেন তারা, কিন্তু তাতেও ব্যর্থ হলেন। সে কেঁদে মন্দিরের মধ্যে মৃৎ কুমারের কথা তার পিতাকে জানাল। সদাগর তখন বললেন—

"শুন লো পরাণের ঝি কইয়া যাই আমি।
সামনে আছে মরা কুমার সেই তোমার স্বামী।।

... ...

জন্মের মত থইয়া যাই আর না হইব দেখা।
সোয়ামীরে জীয়াইয়া তুমি রাখ্যো হাতের শাঁখা।।"

তারপর সদাগর সেখান থেকে চলে গেলে সেই কন্যা মরা কুমারের শিওরে বসে কাঁদতে লাগল। কিছু সময় পর আবার মন্দিরের দরজা খুলে গেল। কাজলরেখা তখন দেখল এক সন্ন্যাসী সেই মন্দিরে প্রবেশ করলেন। তাঁকে দেখেই কন্যা তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ল এই ভেবে যে তিনি নিশ্চয় অলৌকিক শক্তিধারী, তিনি তার স্বামীকে জীবিত করে তুলতে পারবেন। এরপর সন্ন্যাসী কাজলরেখাকে অভয় দিয়ে বললেন তার চিন্তা নেই। মৃত কুমারের গায়ের সূচকাঁটাগুলি তাকে একে একে খুলতে হবে। শুধু চোখ দুটির সূচকাঁটা সবশেষে খুলে সন্ন্যাসীর দেওয়া পাতার রস সেখানে দিলেই মৃত কুমার বেঁচে উঠবে। কিন্তু একটা সাবধান বাণীও সন্ন্যাসী বললেন যতদিন ধর্মমতি শুক নিজের পরিচয় না দেবে ততদিন শত দুঃখেও সে তার স্বামীর কাছে আত্মপরিচয় দিতে পারবে না, না হলে কাজলরেখা বিধবা হবে। একথা বলে সন্ন্যাসী চলে গেলেন।

তারপর কাজলরেখা সাতদিন সাতবার বসে বসে মরা স্বামীর শরীর থেকে একটা একটা করে সূচকাঁটা বের করতে থাকল। এরমধ্যে একটি বারের জন্যও সে মন্দির থেকে বের হলও না কিছু খাওয়া দাওয়াও করল না।

আট দিনের দিন চোখের সূচ দুটা তখন বাকি রেখে কাজল রেখা বের হলে সামনে একটা পুকুর দেখতে পায়। সেই পুকুরের বাঁধা ঘাট ও ডালিমের রঙের মতো জল দেখে তার স্নান করতে ইচ্ছে হল। তারপরেই পুকুরের অপর পার দিয়ে একটি লোক তার কন্যাকে নিয়ে যেতে দেখলে তার তাদেরকে সাধারণ লোক বলেই মনে হল। কন্যাটির বয়স ১৩/১৪ বছর হবে। সেই লোকটি কাজলের কাছে এসে কন্যাকে বিক্রির কথা বলল। পেটের দায়ে পিতা তাকে বিক্রি করতে বের হয়েছে কিন্তু বিক্রি করার লোক পাচ্ছে না। সন্ন্যাসীর কথাতে সে এদিকে এসেছে এক রাজকন্যার খোঁজে। কাজলরেখা মনে মনে ভাবল তার পিতা তাকে নিষ্ঠুরের মতো একা বনে রেখে গেছেন আর এই পিতা পেটের দায়ে কন্যাকে বিক্রি করতে চাইছে। এরপর জনম দুঃখিনী এই কন্যাকে একটি কঙ্কন দিয়ে দাসী হিসেবে কিনে নিল। সেই দাসীকে ভাঙা মন্দির দিয়ে কাজল বলল সেখানে তার মৃত স্বামীকে দেখে ভয় না পেতে এবং তার পাশে রাখা পাতার রস বের করে রাখতে। সে স্নান করে এসে দুটি চোখের সূচ বের করে সেই রস তার স্বামীর চোখে দিলেই সে বেঁচে উঠবে। একথা বলার সময়ই কাজলের বামচোখ কেঁপে ওঠে।

মন্দিরে যেতে যেতে সেই দাসীর মাথায় দুষ্ট বুদ্ধি খেলে। সে কুমারের দুই চোখ থেকে সূচ বের করে পাতার রস ঢাললে কুমার বেঁচে ওঠে। তখন—

"অঙ্গ ঝাড়া দিয়া কুমার উঠিল জাগিয়া।
কাঙ্কন দাসী কয় "কুমার"! আমারে কর বিয়া।।"

ঠিক সে সময় ভিজা কাপড়ে মন্দিরে প্রবেশ করে কাজলরেখা দেখতে পেল তার স্বামী বেঁচে উঠেছে। তার রূপ দেখে কুমার তার পরিচয় জানতে চায় কিন্তু সন্ন্যাসীর বাণীর কথা মনে পড়লে সে নিজের পরিচয় আত্মগোপন করে। তখনই কঙ্কন দাসী বলে ওঠে তাকে সে টাকা দিয়ে কিনেছে, সে তাঁর দাসী—

"আগু হইয়া পরিচয় কহে কাঙ্কন দাসী।
কঙ্কনে কিন্যাছি ধাই নাম কাঙ্কন দাসী।।
রানি হইল দাসী আর দাসী হইল রানি।
কর্মদোষে কাজলরেখা জন্ম অভাগিনী।।"

তারপর কাজলরেখা স্বামীর সাথে দাসী হয়েই স্বামীর রাজ্যে চলে গেল। এভাবেই দিন যায়, রাত যায়। নকল রানি কাজলরেখাকে আড়াল হতে দেয় না। সুচ রাজাও খুব খেয়াল করেন দাসী কাজলরেখা মানে কঙ্কনের চাল চলন যান দাসীর মতো নয়, তার আদব-কায়দা বিশেষ করে তার রূপের ছটা দেখে তিনি পাগল হয়ে পড়েন। নিত্যদিন তার পরিচয় জিজ্ঞেস করেন রাজা, কিন্তু কোন হদিশ পেতেন না ঠিক করে। অন্যদিকে নকল রানির স্বভাব চরিত্রে কথা বার্তায় একেবারে তিনি অতিষ্ট হয়ে পড়েন। এভাবে নানা দুঃখ কষ্টের মধ্য দিয়ে কাজলরেখা নিজেরই স্বামীর ঘরে বার বছর কাল দাসীর মতো জীবন কাটাল। তারপর একদিন শুকপাখি কাজলরেখার আসল পরিচয় প্রকাশ করলে রাজা কাজলরেখাকে বিয়ে করেন এবং নকল রানিকে দণ্ড দিলেন।

অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন 'ক'

১। কঙ্ক ও লীলা'র পালার কাহিনি সংক্ষেপে লিখুন। (২০০ শব্দের মধ্যে)
২। কাজল রেখা পালার কাহিনি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করুন। (২০০) শব্দের মধ্যে)

১৩.৫ শব্দার্থ বোধ

❖ **কঙ্ক ও লীলা পালা**

- মাটিয়ারা= ষষ্ঠীর দিনে
- তেরাখিয়া= ত্রিদোষ মুক্ত
- খাকুরা= যে মানুষ খায়
- শাউনিয়া= শ্রাবণ মাসের
- বাথান= গোচারণের মাঠ
- চান্নি= জ্যোৎস্না
- মৈলান= মলিন

- বর্ষাতিয়া= বর্ষাকালের
- গাগরি= কলসী
- ফেরুযাই= ফরমাসী গান
- সারগিদ= সাকরেদ, শিষ্য

❖ হেকমত= ক্ষমতা

- মালঞ্চ= ফুল বাগান
- দরিয়া= নদী
- আষাইঢ়া= আষাঢ় মাসের
- সাজুতীয়ার= সাঁজের
- বৈকালীর= বিকাল বেলার
- ইক্ষুকের= আখের, ইক্ষুর
- বিউনী= পাখা
- বোধনে= বোধের সময়
- যাউখাইন= যাউন
- কইতর= পায়রা
- কালাম= মুসলমানী ধর্মশাস্ত্রের বচন
- কালজর= কালকূট বিষ
- মেলানি মাগিয়া= যাত্রাকালে বিদায় লওয়া
- আলুই= এলাইয়া
- সাচান= চিলজাতীয় পক্ষী বিশেষ
- পুষনিয়া= পোষা
- পাটলী= সুরভি গরুর বাছুর
- গয়বি= দৈব
- ঝটিতি= শীঘ্র
- জোয়ায়= যোগ্য হয়
- খাউরি বিউনা= খালৈ(মৎস্যাধার) এবং পাখা
- ভুজিতে= ভঙ্গ করিতে
- নিয়ারে= নীহারে
- চাচুলীর আঁশ= বাঁশ চাঁছিলে যেরূপ আঁশ হয়
- রাঙ্গা ধেনু= রামধেনু
- সায়রে= সাগরে
- ভাটিয়ালে= ভাটির দিকে, নীচু দিকে বয়ে যাওয়া

❖ **কাজলরেখা পালা**

- মিন্নতি= মিনতি
- কিরপায়= কৃপায়
- কুঠীয়াল= বৃহৎ পাকা গৃহের স্বামী
- সুজাতি= সুদৃশ্য
- গোসা= রাগ
- আঙ্গুইট= আংটি
- কালান্যা= সময়ের
- ছাওয়াল= সন্তান
- আন্তি= হাতী
- অবিয়াত= অবিবাহিত
- এরুর= এটার
- দুষ্কের= দুঃখের
- বনেলা= বন্য
- ভাইট্যাল= ভাটিয়াল
- রইদ= রৌদ্র
- দুপইরা= দু প্রহরের
- ঝি= কন্যা
- জিয়াইয়া= জীবন দান করে

• উবাসে= উপবাসে

• ছুরত= সৌন্দর্য

• রাড়ী= বিধবা

• পরদীম= প্রদীপ

• কাম-তনু= রম্য দেহ

• গাওয়ালে= গ্রামে

• জোয়ার= স্থির করে

• বেঁকখাড়ুয়া= পায়ের অলঙ্কার বিশেষ

• জোলার পাছাড়ী= জোলাদের তৈরি করা মোটা সুতার বস্ত্র বিশেষ

• দেউক চড়া= চর ভেসে উঠুক

• পূন্নু= পূর্ণ

• দুরক্ষর বাণী= মন্দ লিখন, দুর্ভাগ্য, খারাপ কথা

• সামায়= প্রবেশ করে

• বির্দ্দমানে= বিদ্যমানে

• পিয়া= প্রিয়া

• আগু=অগ্রসর

• নেহালিয়া দেখা= খুব মনোযোগ সহকারে দেখা

• হকলের= সকলের

• বাইরে কামুলী= দাসী

• বেখনা= আত্মপ্রশংসা

- আমি= তেতুঁল
- আগ্রয়= আগ্রহ
- বের্থা= বৃথা
- চাওনই= চাওয়া
- আইট্যা= শক্ত করে
- চপড়ি= চিতে পিঠা
- চই= একপ্রকারের শাক
- মাইলান= ম্লান
- সল্লা= কুপরামর্শ
- গুয়া= সুপারি
- বাজুইন্যা= বাদক
- আটকুর= সন্তানহীন
- গোসাই= গোস্বামী
- আবড়= আকুল
- রিয়াইত= মুক্তিম রেহাই, মাফ।

১৩.৬ লোকসাহিত্যের উপাদান

'মৈমনসিংহ গীতিকা' র পালাগুলি লোকসংস্কৃতির উপাদানে ভরপুর। কারণ পালাগুলিতে উঠে এসেছে সাধারণ মানুষের জীবন কাহিনি। সেখানে তাই খুব স্বাভাবিক ভাবেই সাধারণ জীবনযাত্রার নিয়মাবলী, জীবন যাপনের যাবতীয় বস্তু ও সেই সঙ্গে মানুষের মনের আশা-আকাঙ্খা প্রভৃতি জায়গা করে নিয়েছে।

'কঙ্ক ও লীলা' পালাতে লক্ষ্য করা যায় কঙ্ক ও লীলা চরিত্র দুটি সমবয়সী হওয়ায় ছোট বেলাতে নানা ধরনের খেলা তারা একসাথে খেলে বড় হয়েছে। তাছাড়া কঙ্ক ব্রাহ্মণ গর্গের কাছ থেকে নানা ধরনের মন্ত্রের সঙ্গে অনেক গানও লিখেছিল, এরমধ্যে ফরমাসী গান, বারোমাসী গান ছাড়াও ভাটিয়ালিও ছিল; যা লোকসঙ্গীতের ধারক ও বাহক বলে গণ্য করা হয়। পালাতে লক্ষ্য করা যায় কঙ্ক পীরের কাছে বসে 'মলয়ার বারমাসী' গান গেয়েছে যা শুনে পীড়ের মন মুগ্ধ হয়ে পড়েছিল। শুধু তা-ই নয় প্রবাদ, প্রবচন, ধাঁধা ইত্যাদি বাকধর্মী লোক-সংস্কৃতির উপাদানও এই পালায় লক্ষ্য করা যায়,।

"জুহরী জহর চিনে বেনে চিনে সোনা।
পীর প্যাগম্বর চিনে সাধু কোন জনা।।"

পালাতে পাই—

"ফেরুষাই বারমাসী সঙ্গীত যে কত।
শিখিয়াছে কঙ্কধর তাহা শত শত।।
ভাটিয়াল গানেতে ঝরয়ে বৃক্ষের পাতা।
এক মনে শুন কহি কাহার বারতা।।"

'কাজলরেখা' পালাতে লোকবিশ্বাসের দিকটি খুব বিপুল ভাবে ফুটে ওঠেছে। শুক পাখি কথা বলা এবং ভবিষ্যৎ গণনা করা লোকসংস্কৃতিরই অংশ বিশেষ। মৃত রাজকুমারের শরীর থেকে সূচ বের করলে সে বেঁচে ওঠে এবং এই বেঁচে ওঠাতে তার চোখে সন্ন্যাসীর দেওয়া ওষধি পাতার রস কার্যকর হয়েছে। এখানে একদিকে যেমন মিথের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় অন্যদিকে লোকবিশ্বাসের উপর নির্ভর করে চলা লোকচিকিৎসার দিকও ধরা পড়ে।

এছাড়াও কাজলরেখার আঁকা আলপনাতে শৈল্পিক লোকসংস্কৃতি প্রমাণ স্পষ্ট—
"আলিপনা আঁইক্যা কন্যা জ্বালে ঘিরতের বাতি।
ভূমিতে লুটাইয়া কন্যা করিল পন্নতি।।"

অন্যদিকে কাজলরেখার তৈরি করা নানা পদের তরকারি, মিষ্টান্ন, পিঠা-পুলি, ক্ষীর ইত্যাদি গ্রামীণ জীবনের একান্তভাবে জড়িয়ে আছে। সেই সঙ্গে খাওয়ার পর তাম্বুল সাজিয়ে দেওয়ার রীতিও উল্লিখিত হয়েছে—

"সোনার ঝাড়ি ভইরা রাখে আচমনের পানি।
তাম্বলে সাজায় কন্যা সোনার বাটাখানি।।
কেওয়া খয়ার দিল কন্যা গন্ধের লাগিয়া।
রন্ধনশালা ঘরে রইল রান্ধিয়া বাড়িয়া।।"

১৩.৭ গীতিকা বৈশিষ্ট্য

'মৈমনসিংহ গীতিকা' শুধু বাংলা সাহিত্যের দরবারেই নয় বিশ্ব সাহিত্যের জগতেও অনন্য স্থান করে আছে। অন্যান্য পালাগুলির মতো 'কঙ্ক ও লীলা' এবং 'কাজলরেখা' পালাতেও গীতিকার বৈশিষ্ট্যগুলি রক্ষিত হয়েছে—

- এই পালাগুলিতে লোকজীবন খুব সাবলীলভাবে ওঠে এসেছে।
- পার্থিব নর-নারীর আশা-আকাঙ্খা ও সুখ-দুঃখের অবিমিশ্র অনুভূতি লীলায়িত হয়েছে।
- এখানে চৈতন্য সংস্কৃতির দেববাদ নির্ভর মানবতা নেই , এর পরিবর্তে প্রকাশিত হয়ে ওঠেছে ধর্ম নিরপেক্ষ মানবতাবাদ।
- গীতিকাগুলি নর-নারীর ব্যর্থ প্রেমের আত্মত্যাগের আশ্রু বেদনায় সজল।
- নাটকীয় চমৎকারিত্বের জন্য ঘটনার উত্থান পতন ও একমুখী অনিবার্য পরিণতি পাঠককে গভীরভাবে আভিভূত করে।

১৩.৮ চরিত্র বিশ্লেষণ

১৩.৮.১ কঙ্ক

'মৈমনসিংহ গীতিকা'-র অন্তর্গত 'কঙ্ক ও লীলা' পালার নায়ক চরিত্র হচ্ছে কঙ্ক। অন্যান্য পালার নায়কদের থেকে একেবারেই আলাদা এই চরিত্র। পরম রূপবান, তীক্ষ্ণ মেধার অধিকারী হয়ে জন্ম নিলেও জীবন ছিল তার জন্মাবধি অতি দুঃখ কষ্টের। ব্রাহ্মণ সন্তান হলেও ছয় মাস মাতা-পিতাকে হারিয়ে অনাথ হলে চণ্ডাল দম্পতির স্নেহে লালিত হয়। কিন্তু পাঁচ বছর বয়সে আবারও অনাথ হওয়া ভাগ্যে জুটে সর্বশাস্ত্রবিদ ব্রাহ্মণ গর্গ ও তার স্ত্রী অনুকম্পা। পুত্রহীন মাতা একমাত্র কন্যার সাথে কঙ্ককেও আপন মমতার আঁচলে ঠাঁই দেন। কিন্তু আজন্ম মাতৃ স্নেহহীন কঙ্কের কপালে মায়ের বিয়োগটাই সত্য হয়ে উঠে। আচার সর্বস্ব গর্গের আশ্রয়ে বড় হওয়া কঙ্কের মধ্যে ধর্মীয় গোড়ামি স্থান পায়নি, তাই পীরের সান্নিধ্যে এসে সে পীরের কাছে দীক্ষা নেয়। শুধু তাই নয়—

"গুরুর আদেশ মানি লিখিয়া পাঁচালী আনি,
পাঠাইলা দেশে আর বিদেশে।
কঙ্কের লিখন কথা, ব্যক্ত হৈল যথা তথা
দেশ পূর্ণ হৈল তার যশে।।"

পীরের আদেশেই কঙ্ক 'সত্যপীরের পাঁচালী' লিখলে তা দেশে বিদেশে প্রচারিত হলে কঙ্কের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। এই খ্যাতির কারণে গর্গ তাকে আবার ব্রাহ্মণত্বে উন্নীত করে সমাজে প্রতিষ্ঠা দেন। গোড়া

কুচক্রী মানুষদের চক্রান্তে কঙ্কের জীবন তছনছ হয়ে পড়ে। হিন্দু মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের মানুষই তাকে অপদস্ত করতে কিছুমাত্র পিছুপা হয় না অন্যদিকে লীলা জড়িয়ে কঙ্কের অপবাদ তার জীবনকে দুঃর্বিষহ হয়ে পড়ে। সমাজপতিরা এ সম্বন্ধে ব্রাহ্মণ গর্গের মন বিষিয়ে তুললে তিনি প্রথমে কঙ্কের তারপর লীলার হত্যা করবেন বলে স্থির করলে ভুল বশত আশ্রমের গাভীর মৃত্যু হয়। গো-হত্যার ত্রুটি সহ্য করতে না পেরে লীলা মৃত্যু বরণ করে। লীলার চিতার আগুন জ্বালার সময় কঙ্ক ফিরে আসে আর তারপর ব্রাহ্মণ গর্গের সাথে নীলাচলে চলে যায়।

গুরুভক্তিতে কঙ্ক সমস্ত পালা জুড়ে প্রবল নিষ্ঠাবান রয়েছে। এমনকি দেবতাসম পিতার সেবায় মনোনিবেশ করতে লীলাকেও সে উপদেশ দিয়েছে। কিন্তু প্রেমিক কঙ্ক সমস্ত পালা জুড়ে নীরব ভূমিকায় রয়েছে। বলা যেতে পারে লীলা যেন তার উপেক্ষিত প্রেম। এই চরিত্রটি গুরুভক্তিতে মহান হলেও সে একজন অসফল প্রেমিক চরিত্র।

১৩.৮.২ লীলা

'মৈমনসিংহ গীতিকা'-র অন্যতম ট্র্যাজিক নারী চরিত্র হল লীলা। মহুয়া, মলুয়া, চন্দ্রাবতীর জীবনেও ট্র্যাজেডি এসেছে কিন্তু সেই তুলনায় লীলা চরিত্রটি ম্লান। সামাজিক অনুশাসন এবং পিতার রূঢ় শাসনের বেড়াজালে লীলা চরিত্র প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত শুধু ছটফট করেছে মানসিক যন্ত্রণায়। নিজের পিতা কিংবা প্রেমিক দুজনের প্রতি ছিল তার নির্মল ভালবাসা। পিতার প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তিতে যেমন কোন ত্রুটি ছিল না তেমনি নিজের প্রেমিককে যথা সর্বস্ব আগলে রেখেছে সব পরিস্থিতিতে। কিছু দুষ্ট মানুষের জন্য নিজের পিতার মন বিষিয়ে আছে বুঝতে পেরে কঙ্ককে আসন্ন বিপদ থেকে বাঁচাতে কঙ্ককে দেশান্তরী করেছে কিছুদিনের জন্য। এমনকি ছোটবেলায় মাতৃহারা হওয়ার পর নিজের দুঃখ ভুলে সে কঙ্ককে সাহারা দিয়েছে। কঙ্ক ধেনু চরাতে গেলে লীলা 'গামছা বান্দা দৈ' তাকে খাওয়াতে না পারলে তার মন ব্যথিত হয়ে পড়ত। লীলার আত্মকথনে আছে—

"পথ নাহি দেখিরে বধু ঝুরে আখি-জলে।
পাগলিনী হইয়া ফিরি তিলেক না দেখিলে।।
নয়নের কাজল চর বন্ধু আরে বন্ধু তুমি গলার মালা।
একাকিনী ঘরে কান্দি অভাগিনী লীলা।।"

লীলার এই আচরণ বৈষ্ণব পদাবলির রাধার সমতুল্য।

পালাতে লক্ষ্য করা যায় কঙ্কের গৃহ ত্যাগ ও সুরভি ধেনুর মৃত্যু যেন তাকে আরও বেশি একাকীত্বের দিকে ঠেলে দেয়। তার মানসিক যন্ত্রণা বেরে যায়। 'লীলার কষ্ট' ও ষান্মাসিকী গীতি' অংশে লীলার যন্ত্রণা প্রকটিত হয়ে ওঠেছে।

"সেইদিন হইতে লীলা ছাড়ল ভাত-পানি।
একেলা বসিয়া কান্দে দিবস-যামিনী।।

কঙ্কের লাগিয়া লীলার তনু হৈল ক্ষীণ।
হায়রে সোনার অঙ্গ লীলার হৈল মলিন।।”

সমাজের কঠোর নির্মম নিয়মের যাঁতাকলে লীলার মত নির্মল হৃদয়ের নারী প্রেম এবং জীবন উভয়কেই পিষে মেরে দেয়। অসহায় লীলা চরিত্র মৈমনসিংহ গীতিকায় করুণার পাত্রী হয়ে রয়ে গেছে কালের দরবারে।

১৩.৮.৩ কাজলরেখা

‘কাজলরেখা’ পালার মূল নারী চরিত্রটি হচ্ছে কাজলরেখা। তার ব্যক্তিগত জীবন সমস্যা একমুখী গতি লাভ করলেও, পালাটিতে তা নাট্যগুণান্বিত হয়ে উঠতে পারেনি।

ধনী সদাগরের একমাত্র কন্যা কাজলরেখা পিতার আদরে প্রতিপালিত হওয়া সত্ত্বেও আজীবন নানা দুঃখ কষ্টের মধ্যেই জীবন অতিবাহিত করেছে। এগার বছর বয়সে বিয়ে হয়েছে এক মৃত রাজকুমারের সাথে। অন্ন জল ত্যাগ করে সাতদিনে কুমারের শরীর থেকে সূচ কাঁটা বের করলেও আট দিনের দিন নিজের স্বামীর কাছে নিজেকে দাসী রূপে পরিচয় দিয়েছে। আর দাসী কঙ্কনের ধূর্ততার জন্য রানি থেকে দাসীতে পরিণত হয়েছে কাজলরেখা। কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলতে পারে নি। কারণ সন্ন্যাসীর সাবধান বাণী ছিল যে নিজে থেকে পরিচয় দিলে রাজকুমারের প্রাণ সংশয় হবে। নিজের স্বামীর প্রাণ বাঁচানো ছিল তার কাছে মুখ্য। তারপর নানা ঘাত প্রতিঘাতে তার জীবনের বার’টি বছর কাটে। রাজকুমারের সন্দেহ হয় আর সে জন্য বার বার তার পরিচয় জানতে চায়। বন্ধুর সাথে যুক্তি করে কাজলরেখা ও কঙ্কনের পরীক্ষা নিলে রন্ধনে কিংবা আলপনায় সমস্ত কিছুতেই কাজলরেখা উচ্চবংশজাত নারী একথা বুঝতে রাজকুমারের বাকী থাকে না। তারপর শুকপাখীর বক্তব্যে সমস্ত কিছুর সম্পর্কে অবগত হলে কাজলরেখার জীবনে সুখ স্থায়ী হয়। এই চরিত্রটি যেন ধৈর্যের প্রতিমূর্তি স্বরূপ। একের পর এক ঘটনাতে কাজলরেখা বিন্দুমাত্র বিচলিত হয়নি। অসীম প্রতীক্ষা দুঃসময় কাটানোর একমাত্র মাধ্যম এই সত্যটিকেই এই চরিত্র প্রতিষ্ঠিত করেছে। তাই কাজলরেখা চরিত্রটি ‘মৈমনসিংহ গীতিকা’-য় এক অসামান্য স্থান জুড়ে রয়েছে।

✍ অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন ‘খ’

১। কঙ্ক চরিত্র বিষয়ে সংক্ষেপে লিখুন। (২০০ শব্দের মধ্যে)
২। কাজলরেখা চরিত্র বিষয়ে সংক্ষেপে লিখুন। (২০০ শব্দের মধ্যে)

১৩.৯ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম

- এই অধ্যায় থেকে মৈমনসিংহ গীতিকার 'কঙ্ক ও লীলা' এবং 'কাজলরেখা' পালা সম্পর্কে বিস্তৃত জানতে পারলাম।
- এই দুই পালায় অন্তর্নিহিত লোকসংস্কৃতির উপাদানগুলির বিষয়ে অবগত হলাম।
- গীতিকার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও জানতে পারলাম।
- পালা দুটির নারী চরিত্র তথা পুরুষ চরিত্র বিষয়েও জ্ঞান লাভ হল।

১৩.১০ অতিরিক্ত পঠন

- আচার্য্য, ড. দেবেশ কুমার (প্রথম প্রকাশ, আগস্ট ২০০৪, তৃতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ মে ২০১২); বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (আধুনিক যুগ); কলকাতা: ইউনাইটেড বুক এজেন্সি
- চট্টোপাধ্যায়, হীরেন (প্রথম প্রকাশ, ১৪০২, সংযোজিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ, ১৪২৯); সাহিত্য প্রকরণ; কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ
- বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. অসিতকুমার (প্রথম প্রকাশ, ১৯৬৬, পুনর্মুদ্রণ, ২০১০-২০১১); বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত; কলকাতা: মর্ডাণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড
- মিত্র, শ্রীসনৎকুমার (প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৩, একাদশ সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০১৪); সাহিত্য টীকা; কলকাতা: সাহিত্য প্রকাশ
- দীনেশচন্দ্র সেন (১৯৫৮ খ্রীঃ); মৈমনসিংহ-গীতিকা; কলকাতা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

১৩.১১ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর-সংকেত

অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন 'ক'

১। নং প্রশ্নের উত্তর-সংকেত: 'কঙ্ক ও লীলা' পালাটির কাহিনি হচ্ছে এক দরিদ্রা ব্রাহ্মণ পরিবারে কঙ্ক-এর জন্ম হয়।..... অন্যদিকে অসাধারণ প্রতিভার জন্য পণ্ডিত গর্গ কঙ্ককে আবারও ব্রাহ্মণ সমাজে মর্যাদা দিতে চান, তাই তাকে জাতে তোলার জন্য উৎসাহী হয়ে উঠেন। ..... কিন্তু জনরবে কঙ্কের জলে ডুবে মৃত্যুর কথা শোনায় তার আশা একেবারে মরে যাওয়ায় সেও প্রাণ ত্যাগ করল। লীলার মৃত্যু দৃশ্য পল্লীকবির কলমে অত্যন্ত মর্মস্পর্শী হয়ে উঠেছে। -এভাবে উত্তর সাজিয়ে লিখুন।

২। নং প্রশ্নের উত্তর-সংকেত: পালাটির কাহিনি এইরকম সাধু ধনেশ্বর জুয়াতে সব হারিয়ে ফকির হয়ে পরেছিলেন।..... তারপর সদাগর সেখান থেকে চলে গেলে সেই কন্যা মরা কুমারের শিওরে বসে কাঁদতে লাগল।..... আট দিনের দিন চোখের সূচ দুটা তখন বাকী রেখে কাজল রেখা

বের হলে সামনে একটা পুকুর দেখতে পায়। .....তারপর একদিন শুকপাখি কাজলরেখার আসল পরিচয় প্রকাশ করলে রাজা কাজলরেখাকে বিয়ে করেন এবং নকল রানিকে দণ্ড দিলেন। -এভাবে উত্তর সাজিয়ে লিখুন।

অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন 'খ'

১। নং প্রশ্নের উত্তর-সংকেত: মৈমনসিংহ গীতিকা'-র অন্তর্গত 'কঙ্ক ও লীলা' পালার নায়ক চরিত্র হচ্ছে কঙ্ক।..... এই খ্যাতির কারণে গর্গ তাকে আবার ব্রাহ্মণত্বে উন্নীত করে সমাজে প্রতিষ্ঠা দেন। ..... এই চরিত্রটি গুরুভক্তিতে মহান হলেও সে একজন অসফল প্রেমিক চরিত্র। -এভাবে উত্তর সাজিয়ে লিখুন।

২। নং প্রশ্নের উত্তর-সংকেত: 'কাজলরেখা' পালার মূল নারী চরিত্রটি হচ্ছে কাজলরেখা।..... কারণ সন্ন্যাসীর সাবধান বাণী ছিল যে নিজে থেকে পরিচয় দিলে রাজকুমারের প্রাণ সংশয় হবে। ..... অসীম প্রতীক্ষা দুঃসময় কাটানোর একমাত্র মাধ্যম এই সত্যটিকেই এই চরিত্র প্রতিষ্ঠিত করেছে। এভাবে উত্তর সাজিয়ে লিখুন।

? ১৩.১২ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। মৈমনসিংহ গীতিকার অন্তর্ভুক্ত 'কাজলরেখা' গীতিকা না রূপকথা? গীতিকা ও রূপকথার বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন। 'কাজলরেখা' কোন পর্যায়ভুক্ত এবং কেন ?

২। 'কঙ্ক ও লীলা' এবং 'কাজলরেখা' পালায় লোকসংস্কৃতির যে উপাদানগুলি রয়েছে সেই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করুন।

৩। কঙ্ক, লীলা ও কাজলরেখা চরিত্রের চরিত্র বিশ্লেষণ করুন।

*** *** ***